মৃত্যু, প্রেম, নববর্ষ এবং একটি নিরীহ গাছ

বি মা ন না থ

'ইসাবেলা অ্যান্ড বেসিল', উইলিয়াম হান্টের আঁকা ছবিতে ভুলে যাওয়া প্রথার ছায়া

আমরা যদিও গরমে ঘামতে ঘামতে নববর্ষের আয়োজন করি, এমনটা কিন্তু সবসময় ছিল না। খুব সম্ভবত এক সময়ে আমাদের দেশে নববর্ষ পালন করা হত শরৎ-হেমন্তে। বছরের ওই সময়টাতে আকাশ-বাতাস যেমন উৎসবের মেজাজে মুখর হয়ে থাকে, তেমন আর অন্য কোনও সময়ে থাকে না। সেই প্রাচীন নববর্ষের উৎসবের কিছু রেশ এখনও রয়ে গেছে। যেমন অগ্রহায়ণ মাসের নামটা। 'অয়ন' বলতে এক বৎসর বোঝায়, আর 'অগ্র' দিয়ে সেই মাসকে বোঝায় যেটা বছরের সবচেয়ে প্রথমে আসে। অর্থাৎ এই মাস দিয়েই এক সময় আমাদের বছর শুরু হত। এই প্রথা আর তার রূপান্তরের একটা ইতিহাস আছে, যা গোয়েন্দাকাহিনির মতো রোমাঞ্চকর, একদিকে বীভৎস অপর দিকে রমণীয়, যা লিখতে টেনে আনতে হবে আকাশের নক্ষত্র থেকে সিন্ধুসভ্যতার সিলমোহর থেকে আমাদের আঙিনার তুলসীমঞ্চটিকেও।

শুরু করা যাক দুই-তিন হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে। বছরের সংজ্ঞা হল, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসা। এই সময়ের মধ্যে যে কোনও একটা দিন থেকেই বৎসর গণনা শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু বছরের সব দিন সমান নয়। বছরের চারটে বিশেষ দিন অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণের অক্ষরেখা তার সূর্যের চারিদিকে যে কক্ষপথে সে ঘোরে, তার ওপর খানিকটা হেলে রয়েছে। এই হেলে থাকার জন্যই পৃথিবীতে ঋতু বদলায়। কখনও দিন খুব দীর্ঘ হয়, কখনও রাত। এই সূত্রেই পাই চারটে বিশেষ দিন: উত্তর গোলার্ধের সাপেক্ষে ভাবলে, যেদিন দিবাভাগ সবচেয়ে দীর্ঘ (২২ জুন), যেদিন রাত সবচেয়ে দীর্ঘ (২২ ডিসেম্বর), আর যে-যে দিন দিবা ও রাতের দৈর্ঘ্য সমান (২১ সেপ্টেম্বর এবং ২১ মার্চ)।

কৃষিসংস্কৃতিতে জড়ানো রাশিচক্র

হ্যাঁ, এ আমরা সকলেই ভূগোলে পড়ে এসেছি, কিন্তু ইতিহাসে এ কথাটা সকলে পড়িনি যে, এই চারটে বিশেষ দিনের মধ্যে কোনও একটাকে নতুন বছরের প্রথম দিন বলে মেনে নেওয়াটা অনেক দিনের রীতি। ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক। কারণ এই দিনগুলোকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সোজা। রোমান

ভারতে হিন্দু গৃহস্থ বাড়িতে যে ধরনের তুলসী বেদীতে সাধারণত সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয় তার সঙ্গে ইজরায়েলের মেগিডোতে আবিষ্কৃত কিছু প্রাচীন উৎসর্গ বেদীর অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এই সব উৎসর্গ-বেদী খ্রিস্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে বানানো। বেদীগুলো বর্গাকার, তার চারটে কোনা শিং-এর মতো উঁচু করে বানানো। ঠিক যে ধরনের তুলসী মঞ্চে আমরা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাই।

সাম্রাজ্যে মার্চ মাস দিয়ে নতুন বছর শুরু হত, সে জন্য সেপ্টেম্বর ছিল সপ্তম মাস, আর অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর ছিল পর্যায়ক্রমে অষ্টম-নবম-দশম মাস। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, মাসের এই নামগুলোর মধ্যে এখনও পুরনো দিনের ব্যবস্থার গন্ধ লুকিয়ে আছে।

ভারতে এখন আমরা যে নিয়মে বছর গুনি, সেটা এসেছে 'সিদ্ধান্ত' যুগ থেকে। খ্রিস্টের জন্মের পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে অনেকগুলো 'সিদ্ধান্ত' নামাঙ্কিত বই লিখেছিলেন তখনকার পণ্ডিতরা—যেমন সূর্যসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। এর আগে যে নিয়ম মানা হত, সেটা ছিল 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ'

ভারতীয় তুলসীমঞ্চ (বাঁদিকে) এবং প্রাচীন ইজরায়েলের উৎসর্গবেদী

অনুযায়ী। এই 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ'-এর নিয়ম মেনে ভারতের বৈদিক যুগে অগ্রহায়ণ থেকে বৎসর গণনা শুরু হত। কয়েকজন ইতিহাসবিদের মতে তারও আগে, সিন্ধু সভ্যতার সময়ও এই অগ্রহায়ণ মাসেই নববর্ষের উৎসব পালন করা হত।

মহেঞ্জোদারোয় একটা সিলমোহর পাওয়া গেছে, যার ওপর একটা চমকপ্রদ ছবি আছে। এর নীচের দিকে ছয়জন মহিলাকে এক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ওপরে বাঁদিকে একটা গাছের দুই শাখার মাঝখানে এক দেবী দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর তাঁর সামনে একটা বেদীর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন একজন পুরোহিত বা পূজারিনি। এবং তাঁদের ডান পাশে একটা শিংওয়ালা জন্তুকে দেখা যাচ্ছে।

সিন্ধু সভ্যতার লিপি-বিশেষজ্ঞ আসকো পারপোলা এই সিলমোহরটির একটা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে নীচের সাতজন মহিলা হলেন সাতজন কৃত্তিকা মাতৃদেবী, যাঁরা কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতীক। এখানে সাতজন কৃত্তিকার কথায় অনেকের খটকা লাগতে পারে। আমরা পুরাণের গল্পে সাধারণত ছয়জন কৃত্তিকা বা মাতৃদেবীর কথা শুনি, যাঁরা কার্তিককে স্তন্যপান করিয়ে বড় করেছিলেন। কিন্তু এইসব পুরাণের আগে, বৈদিক যুগে কিন্তু অন্যরকম ভাবা হত। পরবর্তীকালের পুরাণে যদিও ছয়জন কৃত্তিকার কথা শোনা যায়, বৈদিক যুগে সাতজন কৃত্তিকার কথা বলা হয়েছিল। যেমন তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে একটা শ্লোকে অগ্নির সঙ্গে সাতজন কৃত্তিকার নাম করা হয়েছে (তৈ. ব্রা., ৩য় খণ্ড, ১,৪,১)—অম্বা, দুলা, নিতত্নি, অভ্রয়ন্তি, মেঘয়ন্তি, বর্ষয়ন্তি এবং চুপুনীকা। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন গ্রিক পুরাণেও কৃত্তিকা নক্ষত্রদের সাত বোন কল্পনা করা হয়েছে।

আকাশে বিশাখা নক্ষত্র হল তুলা রাশির অন্তর্গত। তুলার চিহ্ন হল দাঁড়িপাল্লা। কারণ সূর্য যখন তুলারাশিতে থাকে তখন দিন এবং রাত হয় সমান দৈর্ঘ্যের—শরৎকালে।

পারপোলার মতে সিলমোহরের নীচে সাত জন মহিলা আসলে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতীক। তাহলে অন্যদিকে গাছের ডালদুটোর মাঝখানে দাঁড়ানো ওই দেবী কে? ইনি হলেন বিশাখা। গাছের দুই শাখার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। লক্ষণীয় যে, 'বিশাখা' নামের সঙ্গে 'বাইসেক্ট' (bisect) শব্দটির মিল রয়েছে। বিশাখা নামের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আকাশে বিশাখা নক্ষত্র হল তুলা রাশির অন্তর্গত। তুলার চিহ্ন হল দাঁড়িপাল্লা। কারণ সূর্য যখন তুলারাশিতে থাকে তখন দিন এবং রাত হয় সমান দৈর্ঘ্যের—শরৎকালে। দাঁড়িপাল্লায় দিন আর রাত সমান 'ওজনের' ভাবা হয় বলে এই রাশি বা নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম তুলা। অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্রের সঙ্গে দিন ও রাতের সমান ভাবে বিভক্ত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

এই তুলা নক্ষত্রমণ্ডলীর একটা নক্ষত্র হল বিশাখা। পারপোলার মতে এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই ওই সিলমোহরে গাছের দুই শাখার মধ্যে দণ্ডায়মান দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, একদিকে কৃত্তিকা আর অন্যদিকে বিশাখা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ। এর কারণ হল, আকাশে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ এবং তুলা রাশির বিশাখা, এরা একে অপরের প্রায় বিপরীত দিকে অবস্থিত। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জকে আকাশের পুবদিকে উঠতে দেখা গেলে পশ্চিমে দেখা যাবে বিশাখা নক্ষত্র অস্ত যাচ্ছে, যদি সূর্য ওই সময় তুলারাশিতে থেকে থাকে, তাহলে সূর্যাস্তের সময় পশ্চিমাকাশে তুলা রাশির বিশাখা নক্ষত্র দেখা যাবে।

এই দুই নক্ষত্র যেন আকাশে একটা অক্ষরেখার দুই প্রান্তবিন্দুর মতো। সূর্য যখন এই দুই নক্ষত্রের কাছাকাছি থাকে—মার্চ এবং সেপ্টেম্বরে—দিন আর রাত হয় সমান দৈর্ঘ্যের। এমন দুটো তাৎপর্যপূর্ণ দিনের সঙ্গে যুক্ত দুটো নক্ষত্রমণ্ডলী নিয়ে যে অনেক গল্পকথা রচিত হবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কৃত্তিকার মাতৃদেবীর সঙ্গে কার্তিক বা স্কন্দের কথা চলে আসে। পুরাণে স্কন্দ এবং বিশাখ এই দুই দেবতাকে একই রূপে স্কন্দ-বিশাখ বলেও বলা হয়েছে।

পারপোলার মতে, সিলমোহরটিতে এমনই এক মুহূর্তের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। সিলমোহরে যে হরিণের মতো শিংওয়ালা জন্তু দেখা যাচ্ছে, সেটা তাঁর মতে মৃগশিরার প্রতীক। এই মৃগশিরা নক্ষত্র যে আসলে কোন নক্ষত্র সেটা নিয়ে অনেক মতানৈক্য রয়েছে পণ্ডিতদের মধ্যে। তবে সাধারণত একে কালপুরুষ ('ওরিওন') নক্ষত্রমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত বলে ভাবা হয়। এবং এই নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের খুব কাছেই রয়েছে।

বাকি রয়ে যায় বিশাখা দেবীর সামনে বেদীর কাছে বসে থাকা পুরোহিত বা পূজারিনির কথা। পারপোলার মতে সিলমোহরটিতে কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের দৃশ্য ধরে রাখা হয়েছে। যেহেতু সূর্যাস্তের পর কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জকে উদয় হতে দেখা যাচ্ছে, তাহলে এখানে কার্তিক মাসের কথা বলা হচ্ছে। ছবিতে বিশাখা দেবীর মাথার কাছে চাঁদের ছবি দেখে তিনি অনুমান করেছেন যে, এটা হয়তো কার্তিক মাসের পূর্ণিমার চাঁদ, যা দেখে হিসেব ঠিক রাখা সহজ। (অর্থাৎ, তখনকার দিনে

মাসগুলো ছিল পূর্ণিমান্ত)। তাহলে হয়তো কার্তিক মাসের শেষে, একটা পূর্ণিমার রাতের কথা বলা হয়েছে এই ছবিতে।

কিন্তু এর পরেই তো আসে অগ্রহায়ণ, যাকে আমরা আগে প্রাচীন কালের বৎসরের শুরু বলে জেনেছি। এই সব সূত্র ধরে পারপোলা অনুমান করেছিলেন যে, মহেঞ্জোদারোর সিলমোহরে বৎসরান্তের কোনও উৎসবের কথা দেখানো হয়েছে।

মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া সিলমোহর

এখন অবশ্য কার্তিক পূর্ণিমার সঙ্গে সমান দৈর্ঘ্যের দিন-রাত হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। কার্তিক পূর্ণিমা সাধারণত নভেম্বরের মাঝামাঝি হয়, আর সমান দৈর্ঘ্যের দিন-রাত হয় সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে (২১ তারিখ নাগাদ)। এটা কী করে হল? আসলে সূর্যসিদ্ধান্তের রচয়িতারা বৎসর গণনার ব্যাপারে একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন। ভুলটা আপাতদৃষ্টিতে সামান্য, কিন্তু বছরের পর বছর এই ভুল গণনার ফলে এখন আমাদের 'বছর'টা বেশ খানিকটা সরে এসেছে।

আমরা সবাই জানি যে, পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়ে যে-অক্ষরেখা কল্পনা করা হয় সেটা আকাশে ধ্রুবতারার দিকে তাক করে আছে। আসলে এমনটা সব সময় ছিল না, কারণ এই অক্ষরেখাটি স্থির নয়। এই অক্ষরেখা খুব ধীরে ধীরে লাটিমের মতো ঘুরছে। এত ধীরে যে, একবার পুরো ঘুরে আসতে তার ২৬০০০ বছর লেগে যায়। আর এর ফলে আমাদের বৎসর গণনায় একটু গোলমাল হয়—যার পরিমাণ বছরের ২৬০০০ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রায় ২০ মিনিটের মতো। এটা খুব কম মনে হতে পারে, কিন্তু এই সামান্য ভুল ৬০ বছরের শেষে প্রায় একটা পুরো দিনের ভুল হয়ে দাঁড়ায়। আর দেড় হাজার বছর ধরে—সিদ্ধান্ত যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত—এই ভুল ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এখন ২৪ দিনের তফাতে পরিণত হয়েছে।

এই জন্য আমাদের নববর্ষ বলা নেই কওয়া নেই এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এসে পড়ে। আসলে সিদ্ধান্ত যুগের প্রথমে নববর্ষ পালন করা হত ২১ মার্চ—যখন দিন আর রাত সমান (আর যখন সূর্য কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলীতে)। সেটাই ২৪ দিন পিছিয়ে গিয়ে পড়েছে ১৫ এপ্রিল নাগাদ। ওই একই কারণে মকরসংক্রান্তি ২২ ডিসেম্বরে না হয়ে জানুয়ারির মাঝামাঝি পালন করা হচ্ছে। এই সবই হল 'সিদ্ধান্ত' যুগের বইয়ের ভুলকে মাছিমারা কেরানির মতো মেনে চলার মাশুল। মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালে এই ভুল গণনা বন্ধ করার জন্য একটা সরকারি কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। আমাদের পঞ্জিকা রচয়িতারা সেই মান্ধাতার আমলের ভুলটাই মেনে চলেছেন এখনও।

এমন নয় যে প্রাচীন পণ্ডিতরা অক্ষরেখার ঘোরার কথা একেবারেই ভাবেননি। অক্ষরেখার এইভাবে ঘোরার জন্য যে সমান দৈর্ঘ্যের দিবা-রাতের বিন্দুটা স্থির থাকবে না, সেই সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত ছিলেন। তাঁরা একে বলতেন 'অয়ন-চলন'। কিন্তু ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের পণ্ডিতদের লেখা থেকে বোঝা যায় ওই সময় এই বিষয় নিয়ে খুব তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। কোনও কারণে বৎসর গণনার জন্য এই অয়ন-চলনকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। অনেক পরে, প্রায় দশম শতাব্দীতে লক্ষ করা হয় যে, এই গণনা

একই কারণে মকরসংক্রান্তি ২২ ডিসেম্বরে না হয়ে জানুয়ারির মাঝামাঝি পালন করা হচ্ছে। এই সবই হল 'সিদ্ধান্ত' যুগের বইয়ের ভুলকে মাছিমারা কেরানির মতো মেনে চলার মাশুল।

সিন্ধু সভ্যতার লিপি-বিশেষজ্ঞ আসকো পারপোলা সিলমোহরটির একটা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, নীচের সাতজন মহিলা সাতজন কৃত্তিকা মাতৃদেবী, যাঁরা কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতীক। প্রাচীন গ্রিক পুরাণেও কৃত্তিকা নক্ষত্রদের সাত বোন কল্পনা করা হয়েছে।

কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ

অনুযায়ী নক্ষত্রদের যেখানে থাকার কথা, তারা সেখান থেকে বেশ দূরে সরে গেছে। তাই নক্ষত্রের প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণ করার জন্য এই অয়ন-চলন মেনে (অর্থাৎ 'সায়ন') একটা ব্যবস্থা রাখা হল। তবে বৎসর গণনার জন্য আগের নিয়মটাই, অর্থাৎ 'নিরয়ন' বা অয়ন-চলন উপেক্ষা করে চলার নিয়মটাই বলবৎ রইল।

যাই হোক, বৎসর গণনায় এই ভুলের দৌলতে কার্তিকের পূর্ণিমা অক্টোবর থেকে সরে গিয়ে পড়েছে নভেম্বরে। প্রাচীন কালে এই দিনটি আসত ২১ সেপ্টেম্বরের পরে পরেই—বেশি হলে তার এক (চান্দ্র) মাসের মধ্যে। আজ সেটা প্রায় একটা বাড়তি মাস পিছিয়ে গেছে।

কিন্তু এর ফল হয়েছে অদ্ভুত। একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎসব আজ ভুল দিনে পালন করা হচ্ছে। তার প্রাচীন কালের তাৎপর্যটাও হারিয়ে গেছে স্মৃতি থেকে। গল্পের সেই বেড়াল বেঁধে রেখে পুজো করার মতো আসল কারণটা ভুলে গিয়েছি। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এর ফলে এই প্রাচীন স্মৃতিটা একটা 'ফসিল'-এর মতো লুকিয়ে রয়েছে লোকাচারে। এর অর্থ পুনরুদ্ধার করাটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

'তুলা' এবং 'তুলসী'—এ দুটি নামের মধ্যে একটা অনুরণন আছে। এদের মধ্যে ব্যুৎপত্তিমূলক একটা যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

তুলসী মঞ্চ

কার্তিক পূর্ণিমায় ভারতের বিভিন্ন অংশে একটা বিশেষ পুজো হয়। এই পুজোর সঙ্গে তুলসী গাছের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কার্তিকের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে তুলসী পুজো হয়। তার তিন দিন পর পূর্ণিমাতে তুলসী বেদীতে শালগ্রাম শিলার সঙ্গে তুলসীর বিয়ে দেওয়া হয়। একে বলা হয় 'তুলসী বিবাহ'। পদ্ম-পুরাণে বলা হয়েছে, তুলসী অর্থাৎ বৃন্দার বিয়ে হয়েছিল জলন্ধর নামে এক দৈত্যের সঙ্গে। জলন্ধর একটা বর পেয়েছিলেন যে, যতদিন তাঁর স্ত্রী পতিব্রতা হয়ে থাকবেন ততদিন তাঁকে কেউ বধ করতে পারবে না। একবার বিষ্ণু জলন্ধরকে হত্যা করার জন্য বৃন্দার সামনে তাঁর স্বামীর ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হলেন। বৃন্দা সেটা বুঝতে পেরে বিষ্ণুকে অভিশাপ দেন, ফলে বিষ্ণু শালগ্রাম শিলায় পরিণত হন। ইতিমধ্যে শিব জলন্ধরকে বধ করেন। কিন্তু প্রতি বছর এই শালগ্রাম শিলারূপী বিষ্ণুকে বৃন্দা, অর্থাৎ তুলসীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। এই তুলসী বিবাহের একটা বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। ভারতের অনেক অংশে এখনও কার্তিক পূর্ণিমায় তুলসী বিবাহের পরই বিয়ের মরশুম শুরু হয়।

এই বাৎসরিক এবং আনুষ্ঠানিক বিবাহের লোকাচার একটা নতুন দিকে আমাদের তাকাতে বাধ্য করে। অনেকে আমাদের সমাজে বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে প্রাচীন মাতৃপ্রধান সমাজের অনুষ্ঠানের রেশ খুঁজে পেয়েছেন। জেমস্ ফ্রেজার তাঁর 'দ্য গোল্ডেন বাও' বইতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বির মতে আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনিতেও প্রাচীন মাতৃপ্রধান সমাজের চিহ্ন পাওয়া যায়। তিনি উর্বশী-পুরূরবার কাহিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, বৈদিক যুগ থেকে কালিদাসের সময় পর্যন্ত এই আখ্যানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেখা যায় যে, ঋগ্বেদে পুরূরবা তাঁর স্ত্রী উর্বশীর কাছে প্রাণভিক্ষা করছেন, এবং উর্বশী সেই আর্তিতে কান না দিয়ে তাঁকে হত্যা করছেন। এই গল্পটা পরে একটা চিরন্তন মিলন-বিরহের গাথার আকারে রূপান্তরিত হয়েছিল। কোসাম্বির মতে উর্বশী আসলে একজন পূজারিনি ছিলেন, আর পুরূরবা ছিলেন তাঁর সাময়িক প্রেমিক—উর্বশীর, অর্থাৎ তাঁর প্রেমিকা-পূজারিনির হাতে তাঁর মৃত্যু অবধারিত ছিল। কোসাম্বির মতে, ঋগ্বেদের শ্লোকগুলি হল একটা ধর্মাচারভিত্তিক নাটকের অংশ, যেটা সেই যুগে হয়তো অভিনীত হত, এবং তারও আগে হয়তো তা ঘটত বাস্তবে।

এই পূজারিনিদের সঙ্গে বৎসরে একবার কোনও পুরুষের বিয়ে দেওয়া হত, এবং বৎসরান্তে তাকে বলি দেওয়া হত। মাতৃপ্রধান সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হয়ে ওঠার পর এই পূজারিনিদের কাহিনি পরিবর্তিত হয়ে স্বর্গের অপ্সরাদের কাহিনিতে পরিণত হল। পরে এই প্রাচীন পূজারিনিদের স্মৃতি থেকেই জন্ম নেবে দেবদাসী প্রথা।

কোসাম্বিদের মতে, এই পরিবর্তন এসেছিল লাঙলের ফলার আবিষ্কারের পর। লাঙল-বলদের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই কৃষিকাজ পুরুষের আওতায় চলে গিয়েছিল, কারণ সেটাতে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল। শুধু তাই নয়, লাঙলের ব্যবহার কৃষি উৎপাদনে এক ধরনের বিপ্লব এনেছিল। যার ফলে এসেছিল উদ্বৃত্ত ফসল, আর যার ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে পিতৃপরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

শুধু ভারতে নয়, সুদূর গ্রিস এবং এশিয়া মাইনরের পৌরাণিক কাহিনিতেও এমন চিহ্ন পাওয়া গেছে। অতি প্রাচীন, প্রাক-হেলেনিক যুগের গ্রিক পৌরাণিক গল্পে প্রায়ই দেখা যায় যে, দেবী তাঁর প্রেমিক বা রাজাকে তাড়া করছেন এবং বৎসরান্তে দেবীর হাতে রাজা নিহত হচ্ছেন। পরের যুগের কাহিনিতে সেটা বদলে গিয়ে দেখা যায় ঠিক তার উল্টো। অনেকে এর মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে পিতৃপ্রধান সমাজে রূপান্তরের চিহ্ন পেয়েছেন। প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজে মাটির উর্বরতা রক্ষার জন্য অনেক আচারভিত্তিক জাদুক্রিয়া পালন করা হত। জমিতে ফসল উৎপাদনের মধ্যে বাৎসরিক আবর্তনের যে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে, সেটাকেই এই এক বছরের বিয়ে এবং তারপর বলির আচারগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। এই উৎসবগুলো ছিল শস্যপ্রাণের মৃত্যু এবং তার পুনরুজ্জীবনের প্রতীক। এইভাবে সাময়িক স্বামীর বলিদানের মাধ্যমে পূজারিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতেন। বলির পর আবার একজন পুরুষের সঙ্গে পূজারিনির বিবাহ হত। আসলে এই পূজারিনি ছিলেন উপাস্য মাতৃদেবীর, অর্থাৎ ধরিত্রীদেবীর প্রতিভূ। এই সব প্রাচীন আচারের কিছু কিছু অংশ আজও বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

কোসাম্বি তাঁর 'মিথ অ্যান্ড রিয়েলিটি' বইতে দেখিয়েছেন, ভারতে হিন্দু গৃহস্থ বাড়িতে যে ধরনের তুলসী বেদীতে সাধারণত সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয় তার সঙ্গে ইজরায়েলের মেগিডোতে আবিষ্কৃত কিছু প্রাচীন উৎসর্গ বেদীর অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এই সব উৎসর্গ-বেদী খ্রিস্টের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে বানানো। বেদীগুলো বর্গাকার, তার চারটে কোনা শিং-এর মতো উঁচু করে বানানো। ঠিক যে ধরনের তুলসী মঞ্চে আমরা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাই।

'ইসাবেলা' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন জন কিটস্, বোকাচিওর একটা গল্প অবলম্বনে। এই গল্পে নায়িকা ইসাবেলার ভাইয়েরা তার প্রেমিককে হত্যা করার পর ইসাবেলা ওই মৃতদেহ থেকে মাথাটাকে কেটে নিয়ে একটা পাত্রে রেখে তার ওপর

বৈদিক যুগ থেকে কালিদাসের সময় পর্যন্ত এই আখ্যানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ঋগ্বেদে পুরূরবা তাঁর স্ত্রী উর্বশীর কাছে প্রাণভিক্ষা করছেন, এবং উর্বশী সেই আর্তিতে কান না দিয়ে তাঁকে হত্যা করছেন। এই গল্পটা পরে একটা চিরন্তন মিলন-বিরহের গাথার আকারে রূপান্তরিত হয়েছিল। কোসাম্বির মতে প্রেমিকা-পূজারিনি উর্বশীর হাতে তার সাময়িক প্রেমিক পুরূরবার মৃত্যু অবধারিত ছিল।

বেসিল গাছের চারা সমেত মাটি ভরে রাখে। তারপর থেকে সে সবসময় তার কাছে সেই বেসিল, অর্থাৎ তুলসী গাছের পাত্রটা রাখত, মৃত প্রেমিকের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। তুলসীর সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক হিন্দুধর্মেও রয়েছে। মরণোন্মুখ বা মৃতব্যক্তিকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়। মৃতদেহের কপালে, চোখের পাতায় তুলসীর পাতা রাখা হিন্দুদের সৎকারের অঙ্গ।

বোঝাই যাচ্ছে, তুলসীকে আমরা একান্তভাবে ভারতীয় তথা হিন্দু আচার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়ানো এক গুল্ম বলে জানলেও এই আদ্যোপান্ত আটপৌরে জিনিসটি তার ছাপ ফেলে গেছে পৃথিবী জুড়ে। অনুষঙ্গে তুলসী রয়েছে এমন কয়েকটি বৃত্তান্ত দেখা যাক। যেমন ইতালিতে।

ইতালিতে এক ধরনের তুলসীর নাম হল 'বাচা নিকোলা' ('bacia Nicola'), যার অর্থ: 'নিকোলাস, আমায় চুম্বন করো।' মেয়েরা প্রেমিকদের কাছে যাওয়ার সময় চুলে এই তুলসীপাতা গুঁজে দেয়। লুচিনো ভিসকোন্তির ১৯৫০ সালের 'লা তেরা ত্রেমা' ছবিতে দেখা যায়, একটি মেয়ে একজন পুরুষকে প্রেমের প্রলোভন দেখাচ্ছে, এবং তখন ক্যামেরায় মেয়েটির ঘরের জানালার পাশে একটি তুলসী গাছের টবকে বিশেষ ভাবে দেখানো হচ্ছে। বোঝা যায়, প্রেমের সঙ্গে তুলসীর সম্পর্ক সমষ্টিগত চেতনায় কত গভীরে চারিয়ে গেলে চলচ্চিত্রে এমন সংকেত প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ্রিসদেশে এখনও পয়লা জানুয়ারিতে তুলসীপাতা বেটে এক ধরনের কেক তৈরি করা হয়, যার নাম 'বাসিলোপিতা'। খ্রিস্টানরা এইদিনটিতে সন্ত বেসিলের পুজো করেন। মার্গারেট হাসলুক ১৯২৭ সালে লেখা একটা প্রবন্ধে এই সব লোকাচার বিশ্লেষণ করে অনুমান করেছিলেন যে, এই অনুষ্ঠানটা খ্রিস্টের জন্মের বহু আগে, একেবারে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। তিনি বলেছেন, প্রাচীন কালে যখন কোনও এক-বছর মেয়াদের রাজাকে বলি দেওয়া হত, তখন নববর্ষের উৎসবে এই খাবার খাওয়া হত। গ্রিক ভাষায় রাজাকে বলা হয় 'বাসিলিয়াস'। এই কথাটা থেকেই 'বেসিল' নামটা এসেছে বলে তিনি অনুমান করেন। এবং তিনি এও বলেছেন যে, পরবর্তীকালে এইসব লোকাচার খ্রিস্টধর্মের আওতায় আনার জন্য পয়লা জানুয়ারির দিন এই কেক বানানোর প্রথা শুরু করা হয়।

মৃত্যু, প্রেম এবং নতুন বছর—এই অসংলগ্ন বিষয়গুলোকে যোগসূত্রে বেঁধেছে তুলসীর মতো একটা আপাত নিরীহ গাছ! এই যোগাযোগটা যে সম্পূর্ণ কাকতালীয় নয় তার প্রমাণ মেলে তুলসী বিবাহের অনুষ্ঠানের সময়টাকে লক্ষ করলে। এই পুজোটা ভারতে এখনও কার্তিক পূর্ণিমার দিনে হয়। আগেই জেনেছি যে, প্রাচীন ভারতে কার্তিক মাসের শেষে—খুব সম্ভবত কার্তিক পূর্ণিমার সময়—পুরনো বছর শেষ হত। এর পরের দিনই ছিল অগ্রহায়ণের প্রথম দিন, আর অগ্রহায়ণের অর্থও হল 'বছরের প্রথম'। এর পর যদি তুলসী বা বেসিলের সঙ্গে নববর্ষের উৎসব এবং তুলসী বেদীর সঙ্গে প্রাচীন মাতৃপ্রধান সমাজের উৎসর্গ বেদীর যোগাযোগটা মনে করি, তাহলে অনুমান করা যায় প্রাচীন নববর্ষের উৎসবের—অর্থাৎ বাৎসরিক বলি এবং তারপর নতুন বিবাহ—এর রেশটা আমরা এখনও তুলসী বেদীতে শালগ্রাম শিলার সঙ্গে বিবাহের মধ্য দিয়ে পালন করে আসছি।

ঘুরেফিরে মাতৃপ্রধান সমাজের কথা আসছে। তাই এখানে এটা জানিয়ে রাখি যে, সাধারণত তুলসী বা বৃন্দাকে ভারতের যে অঞ্চলের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবা হয়, সেই বৃন্দাবন বা মথুরার প্রাচীন ইতিহাসে মাতৃপ্রধান সমাজের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। রোমিলা থাপার দেখাচ্ছেন, এই অঞ্চলে প্রাচীন কালে যে যদুবংশের লোকজন বাস করত তাদের সমাজ ছিল মাতৃপ্রধান। অনেকে এই সূত্র ধরে মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্মের উৎস খুঁজতে গিয়ে এখানকার প্রাচীন মাতৃপ্রধান সমাজের প্রভাব লক্ষ করেছেন।

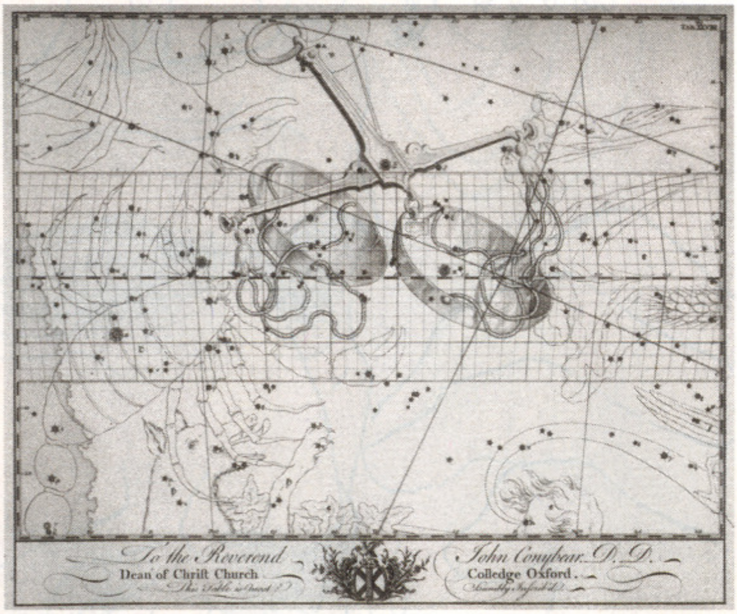

তুলা ও বৃশ্চিক। জন বেভিস-এর আঁকা 'ইউরানোগ্রাফিয়া ব্রিটানিকা' (আনু. ১৭৫০ খ্রি.)

সপ্তদশ শতকে জন জেরার্ড উদ্ভিদবিষয়ক এক বইতে এমনও লিখেছিলেন যে, তুলসী পাতা চিবিয়ে রেখে দিলে সেখান থেকে আপনা-আপনি বিছে জন্ম নেবে। মাথার ওপর তাকাই। দেখতে পাই আকাশে তুলা রাশির পরেই রয়েছে বৃশ্চিক রাশি।

বৈষ্ণব ধর্মের অনেক আচার-বিধির মধ্যে, এবং 'হরিবংশ'-র কাহিনির মধ্যে উর্বরতা-নির্ভর প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলোর চিহ্ন রয়েছে। রাধাভাব এবং সখীভাবের সাধনা হয়তো নারীত্ব কামনারই একটা পরিচয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৈষ্ণবদের মধ্যে তুলসী গাছের কাণ্ড থেকে তৈরি কণ্ঠী পরার প্রচলন রয়েছে।

ফিরে আসি রাতের আকাশের নীচে। প্রাচীন কালে কার্তিক পূর্ণিমার সময় সূর্য থাকত বিশাখা নক্ষত্রের কাছে, অর্থাৎ তুলা রাশিতে। 'তুলা' এবং 'তুলসী'—এ দুটি নামের মধ্যে একটা অনুরণন আছে। তুলা রাশি এবং তুলসী গাছ এই দুটো জিনিস আনুষ্ঠানিক দিক দিয়ে জড়িত, তাই এদের মধ্যে ব্যুৎপত্তিমূলক একটা যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তুলসী কি তাহলে বছরের সেই সময়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন যখন সূর্য তুলা রাশিতে থাকত?

তুলা রাশির সঙ্গে তুলসীকে মিলিয়ে দেবার ফলেই সম্ভবত ইউরোপে নানান কুসংস্কার জন্ম নিয়েছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে তুলসীর সঙ্গে বিছের একটা সম্পর্ক আছে এমনটা ভাবা হত। সপ্তদশ শতকে জন জেরার্ড উদ্ভিদবিষয়ক এক বইতে এমনও লিখেছিলেন যে, তুলসী পাতা চিবিয়ে কোথাও রেখে দিলে সেখান থেকে আপনা-আপনি বিছে জন্ম নেবে। মাথার ওপর তাকাই। দেখতে পাই আকাশে তুলা রাশির পরেই রয়েছে বৃশ্চিক রাশি।

তুলা রাশি, তুলসী গাছ, নববর্ষের বলির অনুষ্ঠানের মধ্যেকার যোগসূত্রগুলো দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে গেছে। শুধু রয়ে গিয়েছে তুলসী বিবাহের মতো কিছু লোকাচার, যার আসল অর্থ হয়তো আমরা ভুলে গিয়েছি। আর থেকে গেছে শরত-হেমন্তের মন-কেমন-করা উৎসবের মেজাজ।

লাঙলের ব্যবহার কৃষি উৎপাদনে এক ধরনের বিপ্লব এনেছিল। যার ফলে এসেছিল উদ্বৃত্ত ফসল, আর যার ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে পিতৃপরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

লেখক রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গবেষণারত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী